বাংলাদেশের শিক্ষাধারার গতিপ্রকৃতি

এ এন রাশেদা

১. ভূমিকা:

২০১৭ সালে যে পাঠ্যপুস্তক দেয়া হলো– তা নিয়ে বিতর্কের ঝড় উঠেছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় লালিত বিদ্যোৎসাহী জনগোষ্ঠীর মাঝে, তার সঙ্গে দেখা দিয়েছে হতাশাও। অন্যদিকে হেফাজতে ইসলামের আমীর শাহ আহমদ শফি বলেন, দীর্ঘদিনের আন্দোলন ও প্রতিবাদের ফলে সরকারের নীতিনির্ধারকেরা বিষয়টির গুরুত্ব ও নাজুকতা বুঝতে পেরে সিলেবাসে কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন এনেছে। তিনি আরো বলেছেন যে, 'পাঠ্যপুস্তকে হেফাজতের দাবি শতভাগ পূরণ করা হয়েছে বলে যারা বিতর্ক তুলতে চাচ্ছে, তাদেরকে সবাই চেনে। তারা সব সময়ই বিতর্কিত ভূমিকা নিয়ে থাকে। তারা নানাভাবে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হেনে বৃহৎ মুসলিম জনসমাজকে বিক্ষুব্ধ করে দেশে অস্থিতিশীলতা তৈরি করতে চায়।'– এই প্রেক্ষাপটেই আজকের আলোচনা সভা– কারা কোন তাগিদে অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি করতে চায়? পাঠ্যসূচিকে সাম্প্রদায়িক করার উদ্যোগ– ২০১৭ সালে এই প্রথম না, আগেও হয়েছিল। আর এই উদ্যোগ রাজনৈতিকভাবে সূচিত হয়েছিল আওয়ামীলীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য খন্দকার মোস্তাক আহমেদ কর্তৃক ১৫আগস্ট ১৯৭৫-এ বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা এবং ৩রা নভেম্বর তাজউদ্দিন আহমেদসহ মুক্তিযুদ্ধের চার জাতীয় নেতাকে জেলঅভ্যন্তরে হত্যার মধ্য দিয়ে। তার পরের ইতিহাস সবার জানা।

২. শিক্ষানীতির ক্রমবিকাশ:

বঙ্গবন্ধু সরকার '৭২ সালে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড. কুদরাত-এ-খুদাকে প্রধান করে ১৯ সদস্য বিশিষ্ট 'বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন' গঠন করেন। মে ১৯৭৪ সালে যা প্রকাশিত হয়ে ড. খুদা কমিশন রিপোর্ট নামে অভিহিত হয়। সে রিপোর্ট রচিত হয়েছিল '৭২-এর সংবিধানের মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে– জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। যার মূলমন্ত্র ছিল *'সামাজিক রূপান্তরের হাতিয়ার রূপে শিক্ষা'*। আর এই শিরোনামে লেখা হয়েছিল: *দীর্ঘদিনের শোষণজর্জরিত সমাজে দ্রুত সামাজিক রূপান্তর ও অগ্রগতির জন্য শিক্ষাকে বিশেষ হাতিয়াররূপে প্রয়োগ করতে হবে। সাম্যবাদী গণতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির স্বার্থে সকল নাগরিকের মেধা ও প্রবণতা অনুযায়ী শিক্ষালাভের সুযোগ-সুবিধার সমতাবিধান দ্বারা জাতীয় প্রতিভার সদ্ব্যবহার সুনিশ্চিত করতে হবে। প্রত্যেকটি মানুষ যাতে স্ব স্ব প্রতিভা ও প্রবণতা অনুযায়ী সমাজজীবন ও ব্যক্তিগত জীবনের সকল ক্ষেত্রে সৃজনশীল ক্ষমতা নিয়ে অগ্রসর হতে পারে, শিক্ষাব্যবস্থাকে তার বাহন হিসাবে ব্যবহার করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে একটি প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনের প্রয়োজনীয় সকল প্রকার বৃত্তিমূলক দক্ষতা সৃষ্টিরও বন্দোবস্ত করতে হবে। নানাবিধ কুসংস্কার, অনাচার ও দুর্নীতি অবসানের অনুকূলে বিজ্ঞানমুখী আদর্শবাদী ও সামাজিক উন্নয়নে পরিপোষক মনোভঙ্গী গড়ে তুলেতে হবে। এ-জন্য দেশের প্রতিটি নাগরিকের একটি ন্যূনতম মান পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।*

২.১ শিক্ষানীতি ২০১০: বর্তমান ২০১০ শিক্ষানীতি– '৭২-এর সংবিধানের ভিত্তিতে রচিত হয়নি। ৩০ জুন ২০১১ সংসদে পঞ্চদশ সংশোধনী বিল পাশ হয়। '৭২-এর সংবিধান ফিরে আসে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' সহকারে শিক্ষানীতি সংসদে গৃহীত হওয়ার পরে। 'হেফাজতে ইসলাম' গোষ্ঠীর দাবি মানতে বাধ্য হওয়ার মূলমন্ত্র যে এর মাঝেই নিহিত, তা বুঝতে খুব বড় আইনজ্ঞ হবার প্রয়োজন পড়ে না। ফেব্রুয়ারি ২০১০ সংসদে গৃহীত হয় শিক্ষানীতি। শিক্ষানীতি ২০১০ প্রসঙ্গে ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ ২৯শে জানুয়ারি ২০১৬– শিক্ষাবার্তা পত্রিকার ২৫ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেছেন– ড. কুদরাত-এ-খুদা *কমিশনের রিপোর্টের পরতে পরতে '৭২-এর সংবিধানের চেতনা বাস্তবায়নের অঙ্গীকার ছিল। কিন্তু ২০১০ শিক্ষানীতি-'৭২-এর সংবিধানের অঙ্গীকারে রচিত হয়নি। '৭২-এর সংবিধান ফিরে আসে ৩০ শে জুন ২০১১। শিক্ষানীতি পাশ হয় ফেব্রুয়ারি ২০১০। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নের অঙ্গীকার– শিক্ষানীতি ২০১০-এ প্রতিফলিত হয়নি। এখানে নৈতিক শিক্ষার নামে ধর্ম শিক্ষকে পাঠ্য বইয়ে সংযোজন করা হয়েছে। আমাদের সংবিধানে যে-ধর্মনিরপেক্ষতার কনসেপ্ট রয়েছে বা সংবিধানের যে-মূল স্পিরিট তার সাথে এ-রূপ ধর্মশিক্ষা অসম্ভব রকমের কন্ট্রাডিক্ট করে।*

তিনি আরো বলেন, ১৯৬২ সালে গণবিরোধী যে-শিক্ষানীতি প্রণিত হয়েছিল– তার বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়েছিল, ছাত্রসমাজ জীবন দিয়েছিল। কিন্তু আজকে আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক হয়েও এদেশের মানুষের ভাবনা, চিন্তা তার সাথে সমন্বিত একটি শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে পারিনি। এর বিরুদ্ধে সেই ভাবে কোনো প্রতিবাদ করাও হচ্ছে না। ব্যাপক পরিসর থেকে কোনো প্রতিবাদ আসেনি। যারা মূল ঘরানার চিন্তা করে অর্থাৎ যাদেরকে বুদ্ধিজীবী বলা হয়– তাদের কাছ থেকেও কোনো মন্তব্য আসেনি। ইউনেসকোসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার পরামর্শ অনুযায়ী জাতীয় আয়ের ন্যূনতম সাত শতাংশ বরাদ্দ শিক্ষাখাতে থাকা উচিত। কিন্তু বাংলাদেশে তা মাত্র ২ শতাংশ। এ-বছর আরও কম ১.৮%। তাই আমাদের উচিত শিক্ষা-আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় '৭২-এর সংবিধানের ভিত্তিতে শিক্ষানীতি প্রণয়নের তাগিদ সৃষ্টি করা।

২.২ অন্যান্য শিক্ষানীতি: ১৯৭৪ এর শিক্ষানীতি পাশ কাটিয়ে ১৯৭৭ সালে কাজী জাফর আহমদের নেতৃত্বে জাতীয় শিক্ষানীতি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। স্বৈরাচারী হুসেইন মো. এরশাদ মজিদ খানের নেতৃত্বে শিক্ষা সংকোচনমূলক যে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে তা ছাত্রসমাজ ১৯৮৩-র ১৪, ১৫ই ফেব্রুয়ারি রক্তমূল্যে প্রতিহত করে। পরবর্তীতে ১৯৮৮ সালে ড. মফিজ খানের নেতৃত্বে প্রণীত হয়েছিল 'বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট'। ১৯৯৭ সালে প্রফেসর ড. শামসুল ইসলামের নেতৃত্বে যে রিপোর্ট প্রণীত হয়েছিল– তা '৭৫ পরবর্তী-রাজনৈতিক দর্শন দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়েই। – লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তারা বলেছিলেন *'এটা খুবই স্পষ্ট যে, পৃথিবীর যে কোনো দেশের শিক্ষাদর্শন রাষ্ট্রীয় নীতির দ্বারা প্রভাবিত। কাজেই শিক্ষাদর্শনের মধ্যে পরিবর্তনশীলতা লক্ষ্যণীয়। আমাদের দেশেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। ১৯৭৫ সালে রাষ্ট্রীয় পরিবর্তন সাধিত হওয়ার পর দেশের চারটি রাষ্ট্রীয় নীতির পরিবর্তন হয় এবং বাংলাদেশের সংবিধানেও পরিবর্তন আসে। এর প্রভাব আমাদের শিক্ষাদর্শনেও প্রতিভাসিত হয়'*। তবে সেই শিক্ষানীতিতে আবার মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধ্যায় লিখিত হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের চেতনার আলোকে– সে আর এক

কাহিনী। এরপর ২০০০ সালে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রীর তত্বাবধানে একটি শিক্ষা কমিটি গঠন করে ২৮ পৃষ্ঠার একটি শিক্ষানীতি সংসদে কণ্ঠভোটে পাশ করান হয়।
এরপর জোট সরকার আমলে সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. মুনিরুজ্জামানের নেতৃত্বে গঠিত হয় শিক্ষা কমিশন–যা জোট সরকারের চেতনার দ্বারাই ছিল প্রভাবিত।

২.৩. শিক্ষাব্যবস্থাকে পশ্চাদমুখীকরণঃ দীর্ঘদিন ধরেই শিক্ষাব্যবস্থাকে পাকিস্তানী ধ্যান ধারণার নিকটবর্তী করার প্রচেষ্টা চলছে ১৯৭৫ পরবর্তী। আশির দশকে 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' করার পর চট্টগ্রাম ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিজ্ঞান বিভাগের কিছু জামাত শিবির সমর্থক শিক্ষকরা ঝাপিয়ে পড়লেন বৃটিশ ও পাকিস্তান শাসনামল থেকেই উচ্চ-মাধ্যমিকে জীববিজ্ঞানে পাঠ্যসূচীভুক্ত– Evolution (অভিব্যক্তিবাদ বা বিবর্তনবাদ)– উঠিয়ে দেয়ার জন্য। তাই হলো। আবার ১৯৯১ সালে এদেরই উদ্যোগে বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে যা ঘটল– তা গোটা বিজ্ঞান শিক্ষাব্যবস্থার উপর সরাসরি আঘাত। '৮০-র দশকে কিছু বিজ্ঞান চিন্তক এবং সচিব পর্যায়ের বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তিদের উদ্যোগে যে শিক্ষা– উপকরণ বোর্ডটি গঠিত হয়েছিল, এশিয়ান ডেভেলাপমেন্ট ব্যাংকের ৩২ কোটি টাকা ঋণের মাধ্যমে– যাদের কাজ ছিল বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি দেশে তৈরি করা এবং বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসারে সহায়তা করা। অর্থাৎ স্কুল কলেজে বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি সরবরাহের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানে আগ্রহী করা। তবে উল্লেখ্য যে নানা ধরনের চার্ট, ম্যাপসহ শিক্ষার অন্যান্য উপকরণও এখানে তৈরি হতে পারত। ১৯৯১ সালে সরকার গঠন ক'রে প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে প্রথম একনেক সভাতেই তা বাতিল করা হয়েছিলো। দেশে বিজ্ঞানকে অবহেলিত করার সুক্ষ্ম কাজ চলছিল। যেহেতু বিজ্ঞান পড়লে শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন করতে শেখে, না জানা কথার উত্তর খোঁজে,
কু-সংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে, বিজ্ঞান মনস্ক হওয়ার পথ প্রশস্থ হয়– তাই এরই ধারাবাহিকতায় ২০০৫ সালে 'এক মুখী শিক্ষা'র নামে বিজ্ঞান শিক্ষাধারার উপর আঘাত করা হল। এ ব্যাপারে তৎকালীন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ঘোরতর জামাতপন্থী শিক্ষা সচিবের আগ্রহী ভূমিকাকেই দায়ী করা হয়েছিল। ব্যাপারটি তারা করেছিল চাতুর্যপূর্ণভাবে। এ ব্যাপারে মুহাম্মদ জাফর ইকবালের বক্তব্য শোনা যাক। 'স্বৈরশাসক জেনারেল এরশাদ আশির দশকে ক্ষমতায় এসে ধর্মের নামে ভণ্ডামির একটা অন্যতম দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। কোনো মহল থেকে কারো কোনো দাবি ছিল না তারপরেও তিনি ধর্ম শিক্ষাকে মাধ্যমিক পর্যায়ে আবশ্যিক করে দিলেন; সাথে সাথে উচ্চতর গণিত ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে নির্বাসিত হলো। আমাদের দেশের বিজ্ঞান শিক্ষার সবচেয়ে বড় ক্ষতিটি এ-ভাবে করে গেছেন একজন স্বৈরাচারী জেনারেল। সেই সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতায় প্রথমে এইচএসসি তারপর ডিগ্রি থেকে গণিত নির্বাসিত হলো। এখন বাংলাদেশ সম্ভবত পৃথিবীর একমাত্র দেশ যেখানে এসএসসি এর একটুখানি সাধারণ গণিতের পর আর কোনো গণিত না পড়ে একজন বিজ্ঞানের ডিগ্রি নিতে পারে। যে বিষয়টা এখনো বলা হয়নি সেটা হচ্ছে ধর্ম শিক্ষা– ভাষা হিসেবে যোগ হয়েছে মুসলমানদের জন্য আরবি, হিন্দুদের জন্য সংস্কৃত এবং বৌদ্ধদের জন্য পালি ভাষা।"

২.৪. সংবিধানের ১৭নং ধারাঃ আমাদের সংবিধানের ১৭ নং ধারায় বলা হয়েছে–
রাষ্ট্র- (ক) একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য,
(খ) সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সংগতিপূর্ণ করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধি করিবার উদ্দ্যেশে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছা প্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য।
(গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে,

তাই টেক্স-বুক বোর্ড শুধু বাংলা মাধ্যমের মাধ্যমিক ধারায় পশ্চাদপদ ভিন্নধর্মী এক-ধারা করার অপচেষ্টা চালিয়েছিল– ইংরেজি মাধ্যম, ক্যাডেট ও মাদরাসা শিক্ষাধারা বজায় রেখে। এই একমুখী ধারার নামে বিজ্ঞানকে বাদ দেয়া হলো। এভাবে মাধ্যমিকে সাধারণ শিক্ষা ধারার নাম করে বিজ্ঞানের মৌলিক বিষয়গুলো পড়তে বাধাগ্রস্থ করা হলো। আর এভাবে বিজ্ঞান' মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষার্থীদের জন্য বিজ্ঞান-বিমুখ এক-ধারা করার চক্রান্ত করা হয়েছিল।

৩. বিজ্ঞানের দুরবস্থাঃ
২২ বছরে বিজ্ঞানে শিক্ষার্থী কমেছে ৪৮ শতাংশ [১২ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী বর্তমানে এর খুব বেশি হেরফের হয়নি]
'দেশে গত ২২ বছরে মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞানের শিক্ষার্থী ৪৭ দশমিক ৮৫ শতাংশ কমেছে। আর শিক্ষাবিষয়ক তথ্য ও গবেষণার সরকারি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ব্যুরো অব এডুকেশন ইনফরমেশন অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিকস (ব্যানবেইস) ১৯৯০ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত ২০ বছরের পরিসংখ্যান দিয়েছে। সে হিসাবে বিজ্ঞানের শিক্ষার্থী কমেছে ২০ বছরে ৪৭ শতাংশ।
আর ২০১০ সালে বিজ্ঞানশিক্ষা-পরিস্থিতি নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক সভায় তথ্য প্রকাশ করে বলা হয়, গত আট বছরে মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞানের শিক্ষার্থী ৩১ দশমিক ৬৩ শতাংশ কমেছে। উচ্চমাধ্যমিকেও কমছে বিজ্ঞানের শিক্ষার্থী।

বিজ্ঞানাগার ও শিক্ষক-সংকট, বরাদ্দও নেই
দেশের বেশির ভাগ বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানাগার সংকট রয়েছে। কিছু কিছু বিদ্যালয়ে নামমাত্র বিজ্ঞানগার থাকলেও নেই প্রয়োজনীয় শিক্ষা-উপকরণ, আছে বিজ্ঞানের শিক্ষকসংকটও।

দেশের ১১টি জেলা-উপজেলায় ২৫টি সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, চারটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভালো মানের বিজ্ঞানাগার আছে। পাঁচটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কোনো বিজ্ঞানাগার নেই। বাকি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয় বিজ্ঞানাগার আছে নামমাত্র।

মাত্র সাতটি বিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের পর্যাপ্ত শিক্ষক আছেন। অন্যগুলোয় বিজ্ঞানের শিক্ষকস্বল্পতা রয়েছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে গণিতের একজন ও জীববিজ্ঞানের একজন করে শিক্ষক আছেন। তাঁরাই রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা পড়ান।

ব্যানবেইস-এর ওয়েবসাইটে এখনো ২০১১ ও ২০১২ সালের তথ্য অন্তর্ভুক্ত হয়নি। তবে এই দুই বছরের মাধ্যমিকে অংশগ্রহণ করা শিক্ষার্থীদের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ২০১১ সালে বিজ্ঞানের শিক্ষার্থী ছিল ২১ দশমিক ৯০ শতাংশ। চলতি বছরে এই সংখ্যা ২২ শতাংশ'। সবকিছু মিলিয়ে এই যখন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের বিজ্ঞান শিক্ষার চিত্র তখন মেডিকেলে ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন তো ফাঁস হবেই, ফাঁস প্রশ্নে ভর্তি করিয়ে ক্লাস শূন্য পড়ে থাকবে– ২০১৬ সালে ঢাকা মেডিকেল, ইব্রাহিম মেডিকেল কলেজসহ অন্যান্য মেডিকেল কলেজের অবস্থা– সে কথাই বলে। দেশ বঞ্চিত হবে মেধাবী দক্ষ জনশক্তি থেকে। বিজ্ঞানমনস্ক সমাজ তৈরি হবে কিভাবে?

উচ্চমাধ্যমিকে বিজ্ঞান শিক্ষায় দুই দশকের উত্থান-পতন

শিক্ষাবিষয়ক তথ্য ও গবেষণার সরকারি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ব্যুরো অব এডুকেশন ইনফরমেশন অ্যান্ড স্ট্যাটিস্টিকসের (ব্যানবেইস) গত দুই দশকের (১৯৯০-২০১০) উচ্চমাধ্যমিকের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, নব্বইয়ের দশকের শুরুতে কয়েক বছর বিজ্ঞানের শিক্ষার্থী তুলনামূলক বেশি ছিল। এরপর আবার তা কমতে থাকে। পরের দশকের শুরুতে আবারও বিজ্ঞানের শিক্ষার্থী বাড়তে দেখা যায়। কিন্তু শেষের দিকে তা আবারও কমতে থাকে।

১৯৯০ সালে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী ছিল মোট শিক্ষার্থীর ২৮ দশমিক ১৩ শতাংশ। এর পর টানা তিন বছর শিক্ষার্থী কমেছে। ১৯৯৩ সালে শিক্ষার্থী নেমে আসে ১৭ শতাংশে। ১৯৯৪ সালে একটু বেড়ে তা প্রায় ১৯ শতাংশ হয়। এরপর কমতে থাকে।

১৯৯৯ সালে তা আবার বেড়ে ১৯ দশমিক ৫৬ শতাংশ হয়। ২০০২ সাল পর্যন্ত বিজ্ঞান শিক্ষার্থী ক্রমান্বয়ে বাড়তে দেখা যায়। ২০০৩ সালে বিজ্ঞানের শিক্ষার্থী ছিল মোট শিক্ষার্থীর ২৫ দশমিক ১৩ শতাংশ, ২০০৪ সালে ২৪ দশমিক ৩৬ শতাংশ, ২০০৫ সালে ২৩ দশমিক ২৫ শতাংশ, ২০০৬ সালে ১৯ দশমিক ৯৫, পরের বছর ২০ দশমিক ১৯ শতাংশ। ২০১০ সালে ১৮ দশমিক ৩৫ শতাংশ।

৪. দেশে এখন অধিক মনোযোগ মাদ্রাসা শিক্ষায়:

প্রতি মাদ্রাসায় অবকাঠামো নির্মাণ ব্যয় ৭০ লাখ টাকা, সাধারণ শিক্ষায় ৫০ লাখ টাকা, কারিগরি শিক্ষায় ন্যূনতম শিরোনামে যে প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়েছে গত ২২-১১-২০১৬ তারিখে *দৈনিক সংবাদ*-এ তা প্রণিধানযোগ্য। আমি হুবহু তা তুলে ধরছি–

'সরকার গত আট বছরে সারাদেশের প্রায় সাড়ে ১৩শ' মাদ্রাসায় নতুন ভবন ও শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ করেছে। গড়ে একটি মাদ্রাসার পেছনে সরকারের ব্যয় হয়েছে প্রায় ৭০ লাখ টাকা। আরও দুই হাজার মাদ্রাসায় নতুন ভবন নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে।

অথচ বিগত আট বছরে কারিগরি স্তরের মাত্র এক ডজন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। আর গত ১০ বছরে প্রায় ৩০ হাজার সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মাত্র সাড়ে আট হাজার প্রতিষ্ঠানে নতুন ভবন নির্মাণ ও সংস্কার করা রয়েছে। এতে গড়ে একটি সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য ব্যয় হয়েছে প্রায় ৫০ লাখ টাকা। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর (মাউশি) এবং শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতরের (ইইডি) ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এ তথ্য জানিয়েছেন।

শিক্ষা প্রশাসনের কর্মকর্তারা বলছেন, মাদ্রাসায় বিল্ডিং হচ্ছে, শ্রেণিকক্ষ হচ্ছে। কিন্তু সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী মাদ্রাসা শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষার ধারায় আনার কোনো প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। সরকার মাদ্রাসার উন্নয়নের নামে বিল্ডিং ও শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ করছে, কিন্তু মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়ন হচ্ছে না।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ প্রায়ই বলেন, 'বিগত চারদলীয় জোট সরকারের আমলে দেশের কোনো মাদ্রাসায় একটি নতুন ভবনও নির্মাণ করা হয়নি। কিন্তু আমরা প্রায় দেড় হাজার মাদ্রাসায় নতুন ভবন নির্মাণের পাশাপাশি কয়েক হাজার মাদ্রাসায় একাডেমিক ভবন সংস্কার করেছি।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে কারিগরি কলেজ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যক্ষ মোহাম্মদ আলী সংবাদকে বলেন, 'কারিগরি শিক্ষার উন্নয়ন কেবল শিক্ষানীতিতেই সীমাবদ্ধ। সরকার মাদ্রাসার উন্নয়ন নিয়ে ব্যস্ত। শত শত মাদ্রাসার উন্নয়ন হচ্ছে, ল্যাব স্থাপন হচ্ছে, কিন্তু সারাদেশের প্রায় চার হাজার কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একটিতেও কোনো অবকাঠামো উন্নয়ন চোখে পরে না। কারিগরি শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের নামে আমলারা বিদেশ ভ্রমণ করছে।'

শিক্ষানীতিতে শিক্ষার মানোন্নয়ন ও প্রগতিশীল সমাজ বিনির্মাণের ওপর গুরুত্বারোপ করা হলেও সরকার এখন মাদ্রাসা শিক্ষার অবকাঠামো উন্নয়নেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। মাদ্রাসার অবকাঠামো উন্নয়ন ও কারিকুলাম আধুনিকায়নের জন্য সরকারের উচ্চপর্যায় থেকেও বারবার চাপ আসছে শিক্ষা প্রশাসনের ওপর। ২০১৫ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে পৃথক মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদফতর। মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নে অর্থ বরাদ্দও নিয়মিত বাড়ছে। মাদ্রাসার উন্নয়নের জন্য সংসদ সদস্যও নিয়মিত ডিও লেটার দিচ্ছেন।

কিন্তু শিক্ষা সংশ্লষ্ট ব্যক্তিদের প্রশ্ন– নীতিমালা ছাড়াই চলে আসা মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য শিক্ষা প্রশাসনের এতো উৎসাহ কেন? এ শিক্ষা কার্যক্রমের ওপর কার্যত কোনো নিয়ন্ত্রণ না থাকলেও কারা এই ধরনের শিক্ষার উন্নয়নের জন্য কাঁড়ি কাঁড়ি অর্থ ব্যয়ের সুযোগ করে দিচ্ছেন? দেশের সাধারণ শিক্ষাকে অবহেলিত রেখে মাদ্রাসা শিক্ষার বিকাশে এতো তোড়জোড় কেন– এসব বিষয় খতিয়ে দেখা প্রয়োজন বলে মনে করছেন শিক্ষা সংশ্লষ্ট বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৪ সালের ৩১ আগস্ট শিক্ষা মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে বেশকিছু নির্দেশনা দিয়েছিলেন। এর মধ্যে ৩ নম্বরটি ছিল মাদ্রাসা সংক্রান্ত। ওইসব নির্দেশনা বাস্তবায়নের তাগাদার অংশ হিসেবে সর্বশেষ গত ১৭ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে একটি তাগাদাপত্র পাঠানো হয়।

এর মাদ্রাসার অংশে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'দেশের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার বিকাশ ঘটেছে। মাদ্রাসা আর টোল শিক্ষাব্যবস্থাপনার ওপর ভিত্তি করে মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। এ লক্ষে যুগোপযোগী কারিকুলাম তৈরি করতে হবে।' শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে এ বিষয়ে সময়াবদ্ধ কর্ম-পরিকল্পনা জানানোর জন্য প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিবের পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হয়েছে।

শিক্ষা সংশ্লষ্ট ব্যক্তিরা বলেছেন, সরকার একদিকে মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়নের নামে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করছেন। আরেকদিকে সারাদেশে নিয়মনীতি উপেক্ষা করে গড়ে উঠছে কওমি মাদ্রাসা। বর্তমানে দেশে প্রায় ২০ হাজার কওমি মাদ্রাসা রয়েছে। এসব মাদ্রাসার ওপর শিক্ষাপ্রশাসন বারবার কর্তৃত্ব আরোপের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হচ্ছে।
এ ব্যাপারে জানতে চাইলে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সদস্য সচিব প্রফেসর শেখ ইকরামুল কবির সংবাদকে বলেন, 'মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের যেহেতু বাদ দেয়া যাচ্ছে না, এজন্য তাদের উন্নয়ন করে সাধারণ শিক্ষার ধারায় নিয়ে আসা হচ্ছে। এখন মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের ইংরেজি ও বাংলা পড়ানো হচ্ছে।'

নায়েমের সাবেক এই মহাপরিচালক বলেন, 'সাধারণ মাদ্রাসার উন্নয়ন করা গেলেও কওমি মাদ্রাসার ওপর প্রশাসনের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। তাদের নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি কমিশন গঠন করা হলেও কওমি মাদ্রাসার প্রতিনিধিরা এটা মানেননি। তারা শিক্ষার মূল ধারায় আসতেও নারাজ। তবে নিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা হলে কওমি মাদ্রাসা নিয়ন্ত্রণে আসতে বাধ্য হতো।'

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অবকাঠামো নির্মাণের কাজ করে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতর (ইইডি)। এ সংস্থার প্রধান প্রকৌশলী দেওয়ান মো. হানজালা সংবাদকে জানান, 'মাদ্রাসার উন্নয়নে এই সরকারই সবচেয়ে বেশি কাজ করেছে। গত আট বছরে সারাদেশে এক হাজার ৩৩২টি মাদ্রাসায় নতুন ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। গড়ে প্রতিটি মাদ্রাসায় প্রায় ৭০ লাখ টাকার অবকাঠামো উন্নয়ন হয়েছে। নতুন আরও দুই হাজার মাদ্রাসার অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে।' মাদ্রাসার পেছনে এতো অর্থ ব্যয়ের ফলে সরকারের কী লাভ হলো– এমন প্রশ্নের জবাবে প্রধান প্রকৌশলী বলেন, 'মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা মূল ধারার শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারছে। মাদ্রাসা ছাত্রছাত্রী ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার হতে পারছে। পিএইচডি ডিগ্রিও অর্জন করতে পারছে।' পাঠক এই ডিগ্রিধারীরা রাষ্ট্রের পরতে পরতে যেয়ে দেশকে সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রে পরিণত করবেনা– তার নিশ্চয়তা বর্তমান সরকার কিভাবে দিবেন? এখনও তা বর্তমান। তাই তো দেখা যাচ্ছে না।

২০০৯ সালে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হলেও, সাত বছরে মাদ্রাসা শিক্ষায় এর প্রভাব পড়েনি। প্রায় ১৬ হাজার এমপিওভুক্ত ও আংশিক এমপিওভুক্ত মাদ্রাসার কার্যক্রম তদারকি করারও যেন কেউ নেই। মাদ্রাসার সুপার ও শিক্ষক-কর্মচারীদের ঢালাওভাবে এমপিওভুক্তি করেছে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর (মাউশি)।
অথচ সকল ধরনের মাদ্রাসাকে একটি সুষ্ঠু ধারার মধ্যে আনতে শিক্ষানীতিতে পরামর্শ থাকলেও দেশের প্রায় ২০ হাজার কওমি মাদ্রাসার কার্যক্রমের ওপর গত সাত বছরে ন্যূনতম নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব আরোপ করতে পারেনি শিক্ষা প্রশাসন। এ ব্যাপারে জানতে চাইলে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের পরিদর্শক আবুল বাশার সংবাদকে বলেন, 'মাদ্রাসা নিয়ন্ত্রণে কোনো নীতিমালা নেই। সাধারণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যে নীতিমালায় পরিচালনা করা হয় সেই আলোকেই মাদ্রাসা পরিচালিত হয়। এর জন্য পৃথক বা সুনির্দিষ্ট নীতিমালা নেই।'
ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে ডেপুটি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতালব্ধ ওই কর্মকর্তা জানান, 'সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তুলনায় মাদ্রাসায় অনিয়ম, জনবল নিয়োগে অস্বচ্ছতা ও পরিচালনা পরিষদে দ্বন্দ্ব কিছুটা বেশি। কারণ বেশিরভাগ মাদ্রাসাই বেসরকারি। সরকারি মাদ্রাসা রয়েছে মাত্র ২/৩টি।'
আবুল বাশার জানান, 'দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল স্তরের মাদ্রাসায় সরাসরি এমপিও দেয় মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর। কিন্তু এবতেদায়ি (প্রাথমিক স্তর) মাদ্রাসায় অনুদান (এমপিও) দেয় সরাসরি শিক্ষা মন্ত্রণালয়। আর এই পরীক্ষার ফল প্রকাশ করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়।'

মাদ্রাসা পরিচালনায় নেই নীতিমালা:
মাদ্রাসা শিক্ষা নিয়ন্ত্রণে কার্যকর কোন নীতিমালা নেই। ১৯৬১ সালের ঢাকা জেলা প্রশাসকের আদেশের ওপর ভিত্তি করে দায়সারাভাবে চলছে মাদ্রাসা শিক্ষা। সরকারের অনুদানে (এমপিও) পরিচালিত হলেও প্রায় সব মাদ্রাসা চলছে সুপার, প্রিন্সিপালসহ গভর্নিং বডির ইচ্ছায়। গভর্নিং বডিতে সুপার ও প্রিন্সিপালরা হচ্ছেন সদস্য সচিব। গভনিং বডিতে এসে প্রভাবশালীরা সরকারের আদেশ নির্দেশ অমান্য করে ইচ্ছেমতো প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছে বলে অভিযোগ দীর্ঘদিনের। এতে প্রতিষ্ঠান পরিণত হচ্ছে নিয়োগ ও ভর্তি বাণিজ্যের হাতিয়ার হিসেবে। অনেক ক্ষেত্রে সুপার ও প্রিন্সিপালরা নিজেদের পছন্দের লোক দিয়ে গভর্নিং বডি বা পরিচালনা পরিষদ গঠন করছেন। এমপিওভুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিষ্ঠানকে সরকারি নিয়ন্ত্রণ আনা জরুরি এবং এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন ও প্রয়োগ দরকার বলেও শিক্ষা সংশ্লষ্ট ব্যক্তিরা মনে করছেন।
জানা গেছে, বর্তমানে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে মাদ্রাসার (সরকার স্বীকৃত) আছে ১৬ হাজার ২২৬টি। এর মধ্যে পূর্ণ এমপিওভুক্ত দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসা আছে সাত হাজার ৬১০টি। এমপিওভুক্ত শিক্ষক আছেন এক লাখ ২০ হাজার। কর্মচারী আছে প্রায় ৪০

হাজার। এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীর জন্য প্রতি মাসে সরকারের ব্যয় হচ্ছে প্রায় দুইশ' কোটি টাকা। আর এবতেদায়ী মাদ্রাসা আংশিক এমপিওভুক্ত। এমপিওভুক্ত সকল মাদ্রাসায় শিক্ষার্থী আছে প্রায় অর্ধকোটি। এছাড়াও নন-এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারী আছে।
একমাস পর পর এমপিওভুক্ত স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শূন্যপদে নিয়োগ পাওয়া শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিওভুক্ত করা হয়। এতে প্রতি এমপিও-তে দুই থেকে তিন হাজার শিক্ষক-কর্মচারী এমপিওভুক্তি পায়। এর মধ্যে মাদ্রাসায় প্রতি মাসে ৭০০ থেকে ৮০০ জন এমপিওভুক্তি পায় অর্থাৎ তুলনামূলকভাবে বা সংখ্যার হিসেবে মাদ্রাসা শিক্ষকরাই বেশি আর্থিক সুবিধা পাচ্ছেন। কারণ শিক্ষক-কর্মচারীদের নিয়োগ, প্রাপ্যতা, শূন্যপদ, মাদ্রাসায় আদৌ প্রয়োজনীয় ছাত্রছাত্রী আছে কী না সেসব বিষয় বিবেচনায় নেয়া হয় না। দেশে তিন ধরনের মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রয়েছে। এর মধ্যে আলিয়া মাদ্রাসা সরাসরি সরকার নিয়ন্ত্রিত ও এমপিওভুক্ত বা আংশিক এমপিওভুক্ত মাদ্রাসা। অপরটি হলো কওমি মাদ্রাসা, যা সরকার অনুমোদিত নয়। ধর্মীয় শিক্ষা বিস্তারের নামে এক শ্রেণীর ব্যক্তি নিজেদের সুবিধা অনুযায়ী যখন যেখানে খুশি কওমি মাদ্রাসা চালু করছে। দাখিল বা মাধ্যমিক স্তরের মাদ্রাসার প্রধানকে বলা হয় সুপার। আলিম বা উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের মাদ্রাসা প্রধানকে বলা হয় প্রিন্সিপাল।
গত এপ্রিলে তৈরি করা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দেশে মোট সরকারি-বেসরকারি এমপিওভুক্ত স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা রয়েছে ৩১ হাজার ৪৪৮টি। এর মধ্যে ২০০৯ সালের এপ্রিল থেকে বর্তমান পর্যন্ত প্রকল্পভুক্ত দশ হাজার ১২৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন কাজ হাতে নেয়া হয়। এর মধ্যে সাত হাজার ৫৬৯টি প্রতিষ্ঠানে নতুন ভবন নির্মাণের পূর্ণাঙ্গ কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। বাকি দুই হাজার ৪১৫টি প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন কাজ চলমান রয়েছে।

মাদ্রাসার উন্নয়নের নামে অপচয়

মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নে প্রকল্প গ্রহণের নামে সরকারি অর্থের যথেচ্ছ ব্যবহারেরও অভিযোগ রয়েছে। জানা গেছে, এই সরকারের আমলে সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট বা এসইএসডিপি প্রকল্পের অধীনে বিভিন্ন জেলার (৩৪টি) মাদ্রাসায় বিজ্ঞান শিক্ষা উপকরণ প্রদান করা হয়। প্রতিটি মাদ্রাসায় প্রায় দেড় কোটি টাকার কম্পিউটার, ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া ও অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে।
পরবর্তীতে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) কর্মকর্তারা পরিদর্শন করে দেখতে পায়– সাতটি মাদ্রাসায় বিজ্ঞান শাখাই নেই। অর্থাৎ এসব মাদ্রাসায় বিজ্ঞান পড়ানোর অনুমোদনই নেই। পরে প্রায় দশ কোটি টাকার শিক্ষা উপকরণ অব্যবহৃত পড়ে থাকে, এবং কিছু উপকরণ অন্য প্রতিষ্ঠানে দেয়া হয়। পাঠক লক্ষ করুণ– এখানে অর্থব্যয়ে সরকার কার্পণ্য করেন না কিন্তু বিজ্ঞান শিক্ষায় এবং সব সাধারণ ধারার শিক্ষা ও শিক্ষকদের অবহেলা করেন। তাই প্রশ্ন– এভাবে কি বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গড়ে উঠবে? গড়ে উঠবে কি মুক্তিযুদ্ধের চেতনার মানুষ? প্রধানমন্ত্রী যখন নিজেই ঘোষণা দিয়ে বলেন– 'আমরা মাদরাসায় সর্বোচ্চ বরাদ্দ দিয়েছি'। আবার কওমি মাদরাসাও নিয়ন্ত্রণহীন। জঙ্গী তৈরির কারখানা হিসেবে কি সে-সব প্রতিষ্ঠান স্বীকৃতি পায়নি? জঙ্গীদের চেতনা কি অসাম্প্রদায়িক? ভবিষ্যতে এরাই দেশ পরিচালনা করে কি– মুক্তিযুদ্ধের চেতনার দেশ গড়বে।

৪.১. বাংলাদেশের শিক্ষাধারায় দুর্নীতিঃ বাংলাদেশের শিক্ষাধারার গতি প্রকৃতি বুঝতে হলে তার দুর্নীতির সার সংক্ষেপ তুলে ধরা প্রয়োজন। ২০০৫ সালে মাধ্যমিক পর্যায়ে একমুখী শিক্ষার নামে বিজ্ঞান শিক্ষাকে কবর দেয়ার যে পরিকল্পনা করা হয়েছিল যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তার পেছনে আর একটি কারণ; তা হলো– ছিল লুটপাটের। প্রথম আলোর রিপোর্টের সারসংক্ষেপ অনুযায়ী কাহিনীটি একটু দীর্ঘ হলেও এর ধারাবাহিকতায় এখনও সব কিছুই ক্রমগতভাবেই অগ্রসর হচ্ছে। তৎকালীন মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কারের লক্ষ্যে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (শতকরা ৭০ ভাগ) ও সরকার (শতকরা ৩০ ভাগ) যৌথভাবে ৪৯০ কোটি ২০ লাখ টাকার তহবিল সেকেন্ডারি এডুকেশন সেন্টার ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (SESIP) গ্রহণ করেছিল– ৬ বছর আগে ১৯৯৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের মেয়াদকালে। পরবর্তীতে জোট সরকারের আমলে সেই প্রক্রিয়া শুরু হয়– কিন্তু শুরুতে ছিলনা কোনো দিক নির্দেশনা। ফলে এতে বড় অপরিকল্পিত উদ্যোগ বাস্তায়নের ঝুঁকি, দায়দায়িত্ব ও বদনাম না-নিয়ে তিনজন পরিচালক স্বেচ্ছায় চলে গিয়েছিলেন। বিতর্কিত এ-প্রকল্পে কথিত শিক্ষা সংস্কার প্রক্রিয়ায় পরামর্শকদের ফি দিতে হয়েছিল ৩৬ কোটি টাকা, ২৬৭ জন শিক্ষা কর্মকর্তাকে বিদেশে পাঠিয়ে ওড়ানো হয়েছিল ৩২ কোটি টাকা। সেই কথিত একমুখী শিক্ষা প্রকল্পের টাকা খরচ হয়েছে– ১৩৩ কোটি টাকায় ২ হাজার পায়খানা নির্মাণ, ২ হাজার নলকূপ স্থাপন, ৫৭টি জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয় প্রতিষ্ঠা, ১১৫টি বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ, ২০টি বিদ্যালয়ের নতুন ভবন নির্মান ইত্যাদি– অথচ এসব কাজ করার জন্য জনশিক্ষা প্রকৌশল, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশলসহ সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও প্রকল্প রয়েছে। শিক্ষা সংস্কারের জন্য ২৬৭ জন শিক্ষা কর্মকর্তাকে অস্ট্রেলিয়া, থাইল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড ও মালয়েশিয়ার একমুখী শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়েছেন কিন্তু বাংলাদেশে তা করা হবে না– অথচ খরচ করা হয়েছিল ৩২ কোটি টাকা। তৎকালীন সরকার ঐ সকল দেশের বিজ্ঞানভিত্তিক একমুখী শিক্ষার বদলে একমুখী মাদরাসা ধারার প্রতি আগ্রহী ছিল। তাই বিদেশ ঘুরে আসা কর্মকর্তাদের বদলী করে ঢাকার বাইরে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল। দেশের টাকা গচ্ছা গেলেও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক সার্ভিস চার্জ বাবদ ১২ কোটি টাকা এবং প্রকল্পের আসবাবপত্র ও যানবাহন কেনার জন্য ২২ কোটি টাকা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন ভাতা বাবদ ৫৮ কোটি টাকা, বিদেশী পরামর্শক ১৬ কোটি এবং দেশী পরামর্শক ১৪ কোটি মোট ৩০ কোটি টাকা ফি পেয়েছিল। শিক্ষা সংস্কারবিষয়ক প্রতিবেদন তৈরি, পর্যালোচনা, শিক্ষা উপকরণ উন্নয়নকর্মী প্রশিক্ষণসহ ১৬ কোটি এবং অন্যান্য খাতে ২১ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছিল। কিন্তু শিক্ষক প্রশিক্ষণ, জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য কোনো অর্থবরাদ্দ ছিল না।

এটি শিক্ষা খাতের অর্থ নিয়ে ছিনিমিনি খেলার একমাত্র ছোট্ট একটি উদাহরণমাত্র। উল্লেখ্য যে, একমুখী শিক্ষা চালুর জন্য এডিবি ঋণ দেয়নি। দিয়েছিল কারিকুলাম ডেভেলাপমেন্ট এর জন্য। ধারণা করা যেতে পারে প্রশাসনের পরতে পরতে যে-সব পাকিস্তানী প্রেতাত্মারা ঘাপটি মেরে

আছে– তাদের পরামর্শে বিজ্ঞানভিত্তিক একমুখী শিক্ষাধারার পরিবর্তে তা মাদরাসা-মুখী শিক্ষাধারার ভিত রচনা করার প্রচেষ্টা করা হয়েছিল–যার বিরুদ্ধে তখন ১১ অক্টোবর ২০০৫ সালে 'শিক্ষাবার্তা' ও 'গণস্বাক্ষরতা অভিযান'-এর যৌথ উদ্যোগে জেলাপরিষদ মিলনায়তন চট্টগ্রামে এবং ২৫শে অক্টোবর ময়মনসিংহে মুসলিম ইনস্টিটিউ মিলনায়তনে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। তেমনি ১৭ অক্টোবর জাতীয় প্রেসক্লাব অডিটরিয়ামে বাংলাদেশ 'শিক্ষা ও শিক্ষক আন্দোলন সমন্বয় ফোরাম' সেমিনারের আয়োজন করে। এ-ছাড়া ঢাকা, জাহাঙ্গীরনগর, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক শিক্ষানুরাগীরা এই তথাকথিত একমুখী শিক্ষার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে পত্রপত্রিকায় লেখালেখি করেন। তৎকালীন জোট সরকার সেই পরিকল্পনা থেকে সরে আসলেও সরকারি সংস্থাসমূহে সেই সব ব্যক্তিবর্গ এবং তাদের অনুসারীরা যে, এ-বারের পাঠ্য বইয়ে দুর্বিনীত দুঃসাহস দেখিয়েছে পাকিস্তানী শাসনামলের মত– তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। আর এ দুর্নীতি এখনও বহাল তবিয়তে বহুগুণ বর্ধিত আকারে আছে।

৪.২ শিক্ষার মানোন্নয়নের নামে কর্মকর্তাদের ভ্রমণ

১২ জনু ২০১৬ দৈনিক সংবাদে শিরোনামে সংবাদটির প্রতি নজর দেয়া যেতে পারে শিক্ষার মানোন্নয়ন প্রকল্পের টাকায় বিদেশ ভ্রমণের হিড়িক পড়েছে। ইংরেজি ও গণিত বিষয়ে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের নামে থাইল্যান্ড ও ফিলিপাইনস ভ্রমণে গেছেন ৫০ জন আমলা ও শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়– এমন সরকারি ও বেসরকারি ব্যক্তি। ওই ভ্রমণে নেয়ার কথা ছিল বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক, অভিভাবক ও স্কুল পরিচালনা পরিষদের সদস্যদের। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের নামে বিদেশি ঋণের অর্থে এই আনন্দ ভ্রমণ নিয়ে শিক্ষা প্রশাসনে বিতর্ক তুঙ্গে। অথচ সৃজনশীল বিষয়ে স্কুল ও কলেজ শিক্ষকরা বিষয়ভিত্তিক কোন প্রশিক্ষণ পাচ্ছেন না। সেকায়েপ প্রকল্পের অধীনে শিগগিরই আরো ৫০ জন ব্যক্তি বিভিন্ন দেশ ভ্রমণে যাবেন বলে প্রকল্প সংশ্লষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

এছাড়াও সেসিপ ও টিকিউআই প্রকল্পের অর্থায়নেও এই ধরণের আনন্দ ভ্রমণের আয়োজন করা হয। বিদেশি দাতা সংস্থার অর্থায়নে পরিচালিত প্রায় সবকটি প্রকল্পেই ইচ্ছেমতো বিদেশ ভ্রমণের সুযোগ রয়েছে। বিদেশ ভ্রমণ, ঘন ঘন কর্মশালার আয়োজন ও বিলাসবহুল গাড়ি ব্যবহারের সুযোগ না থাকলে কোনো প্রকল্পই আলোর মুখ দেখে না বলে একজন প্রকল্প পরিচালক জানিয়েছেন।

সেকায়েপ প্রকল্পের অধীনে গত বৃহস্পতিবার ২৫ জনের একটি টিম থাইল্যান্ডে গেছেন। তারা দেশে ফিরবেন ১৯ জুন। একই প্রকল্পের অধীনে ২৫ জনের আরেকটি টিম ৮ জুন বুধবার রাতে ফিলিপাইনস গেছেন উন্নত প্রশিক্ষণ গ্রহণের লক্ষ্যে। তারা ফিরবেন ১৮ জুন। বর্তমানে সেকায়েপ প্রকল্পের মোট ১৯ কর্মকর্তার মধ্যে প্রকল্প পরিচালকসহ (পিডি) ১৩ জন কর্মকর্তাই বিদেশে আছেন। থাইল্যান্ড ও ফিলিপাইনস ভ্রমণে সরকারের ব্যয় হবে প্রায় দুই কোটি টাকা। ... ইত্যাদি.... ইত্যাদি।

i) দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনা: ৮টি প্রকল্প এডিবির লাল তালিকাভুক্ত

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) নিজেদের আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়ন হওয়া বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের আটটি প্রকল্পকে অনিয়ম এবং অব্যবস্থাপনার কারণে লাল তালিকাভুক্ত করেছে। এসব প্রকল্পের কার্যক্রমে নানা অনিয়ম, বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় চরম অব্যবস্থাপনা, অদক্ষতা ও ধীরগতির প্রমাণ পেয়েছে আন্তর্জাতিক এই দাতা সংস্থাটি। এসব প্রকল্পকে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবেও চিহ্নিত করা হয়েছে।

ii) টিকিউআই প্রকল্পের ৩৪টি গাড়ির অধিকাংশই বেহাত; আরও ৭০টি কেনার প্রস্তাব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের

iii) শিক্ষার মানোন্নয়ন প্রকল্পের গাড়ি নিয়ে বিলাসিতা

iv) মন্ত্রণালয় এডিবি ও পরিকল্পনা কমিশনের বিরোধ

৫. শিক্ষক প্রশিক্ষণ: শিক্ষক প্রশিক্ষণ শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ের দিকে নজর দেয়া যেতে পারে। ২৪ জানুয়ারি ২০১৭ একটি জাতীয় দৈনিকে প্রথম ৩ কলাম জুড়ে শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে- **'সৃজনশীল প্রশিক্ষণে গলদ ও অব্যবস্থাপনা: চার লাখ ৬৮ হাজার শিক্ষকের চার লাখেরও বেশি প্রশিক্ষণ পাননি।** এখন প্রশ্ন এই বিপুল সংখ্যাক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের বাইরে রেখে কিভাবে শিক্ষামন্ত্রী হুমকী দিতে পারেন– কোচিং সেন্টারের বিরুদ্ধে? শিক্ষক পড়াতে অসমর্থ হলে শিক্ষার্থীদের উপায় কী? অভিভাকরাই বা করবে কী? এবার খবরটির দিকে আংশিক দৃষ্টি দেয়া যাক। সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৬ষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মোট শিক্ষক আছেন চার লাখ ৬৮ হাজার ৯৪৩ জন। কিন্তু পাঁচ বছরে সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতিতে পাঠদানের বিষয়ে প্রশিক্ষণ পেয়েছেন মাত্র ৬০ হাজার ৭৭০ জন শিক্ষক। এই প্রশিক্ষণও মাত্র তিনদিনের। চার লাখ আট হাজার ১৭৩ জন শিক্ষক এখনও সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতির উপর বিষয়ভিত্তিক কোন প্রশিক্ষণই পাননি। গত ডিসেম্বরে শিক্ষা সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে পাঠানো 'সেসিপ' প্রকল্পের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য পাওয়া যায়।

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে প্রবীণ শিক্ষক নেতা ও শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির সদস্য অধ্যক্ষ আউয়াল সিদ্দিকী সংবাদকে বলেন, 'আসলে সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতির উদ্যোগ সফল হয়নি। শিক্ষকরা সৃজনশীল প্রশ্ন তৈরি করতে পারছেন না, যথাযথ প্রশিক্ষণও পাচ্ছেন না। আবার শিক্ষার্থীরাও সঠিকভাবে উত্তর না লিখে নম্বর পাচ্ছে, এটা চলতে পারে না। সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতির বিষয়ে পুনর্মূল্যায়ন প্রয়োজন। কারণ এই ব্যবস্থা বুঝতে না পেরে শিক্ষক-শিক্ষার্থী উভয় নোট-গাইড বইয়ের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। এতে শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।'

সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতিতে শিক্ষকদের গলদ নিরসনের নামে প্রশিক্ষণের মেয়াদ বাড়ানো হচ্ছে। বর্তমানে শিক্ষকদের তিনদিনের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে, তা বাড়িয়ে এক মাস করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। কিন্তু প্রকল্প সংশ্লষ্ট কর্মকর্তাদের গাফিলতি, অদক্ষতা ও অনৈতিক তৎপরতার কারণে

প্রশিক্ষণ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের অর্ধেকের বেশি, প্রায় একশ কোটি টাকা ফেরত যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। এর মধ্যে ২০১৭ সালের ডিসেম্বরে 'সেসিপ' প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হবে। 'সেসিপ' প্রকল্পের মাধ্যমে সারাদেশের শিক্ষকদের সৃজনশীল বিষয়ে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। প্রশ্ন হলো–এইসব প্রশিক্ষণের আগেই কেন সৃজনশীল পদ্ধতি চালু করা হলো? এ প্রশ্নের জবাব কে দেবে? জবাব একটাই– মন্ত্রী-আমলা মিলে লুটপাটের স্বর্গরাজ্য তৈরি করা।

৬. শিক্ষা ও শিক্ষক: এবার শিক্ষার খবরের দিকে দৃষ্টি দেয়া যাক ৪ আগস্ট ২০১৬ দৈনিক কালের কণ্ঠের খবর– 'অস্তিত্ব সংকটে ঢাকার ৫১ প্রাইমারি স্কুল, 'কাফনের কাপড় পরে আন্দোলনে শিক্ষার্থীরা'/'এক ঘণ্টা তালাবদ্ধ ভিসি: সড়ক অবরোধ', 'স্কুল ছাত্রদের ওপর পুলিশের হিংস্রতা', 'ভাণ্ডারিয়ায় শিক্ষক সংকট নিরসনে মানববন্ধন'। ৫.৪.২০১৬ দৈনিক সংবাদে রাকিব উদ্দিনের অনুসন্ধানী রিপোর্টের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স ও মাস্টার্স: পাঠদান মান নয়- কোর্স শেষ করাতেই বেশি গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে।' এখানে উল্লেখ করতে হয় যে সম্প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যারা শিক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তাদের কটাক্ষ করেছেন। যদিও তা ছিলী স্কুল পর্যায়ের। কিন্তু উচ্চ শিক্ষাস্তরেও তো একই অবস্থা। তাই এই সন্ধানী রিপোর্টটির খুবই সামান্য অংশ উদ্ধৃত করছি : 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধীনস্থ কলেজ থেকে পাস করা স্নাতকদের যোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ বলে– বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) সর্বশেষ বার্ষিক প্রতিবেদনে মন্তব্য করা হয়েছে। এতে সরকারি কলেজে শিক্ষক স্বল্পতা, শিক্ষকদের যথাযথ প্রশিক্ষণ না থাকা, গবেষণার অভাব, নিয়মিত ক্লাস না হওয়াসহ নানা সমস্যা চিহ্নিত হয়েছে। জাবিকে একটি পরিপূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত স্নাতকোত্তর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করে সেখানে কেবলমাত্র মাস্টার্স ও পিএইচডি পর্যায়ে শিক্ষাকার্যক্রম চালু রাখার সুপারিশ করেছে মঞ্জুরি কমিশন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের খামখেয়ালিপনা আড়াই বছরেও ১৬শ' শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বঞ্চিত শিক্ষক কর্মচারী এমপিওভুক্তি পায়নি ইত্যাদি ইত্যাদি হাজারো সমস্যা।

শিক্ষকদের জন্য পৃথক কর্মকমিশন হবে বলে প্রধানমন্ত্রী ২০১২ সালে ঘোষণা দিয়েছিলেন। সে ঘোষণার খবর কি? সে দিকে খবর নেই কিন্তু আছে মাদ্রাসায়। সব শিক্ষক সংগঠন আজ দালালে পরিণত হয়েছে। তাই দাবি আদায়ের পথ ভুলে গেছে।

৬.১ জাতীয় শিক্ষা আইন: বাইশ পাতার শিক্ষা আইনে কিছু ভালো দিক থাকলেও কিছু আইন ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। যেমন-

যত দোষ শিক্ষকদের : এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদ কিংবা ব্যবস্থাপনা পরিচালনা কমিটির দৌরাত্ম্যের কারণে শিক্ষকরা যে, আজ নাজেহাল তা আজ সকলের নিকট ওপেন সিক্রেট; যেমন বিভিন্ন শিক্ষার মলাটে রাজনৈতিক সমাবেশে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের থাকা বাধ্যতামূলক করা নতুবা শাস্তি হুমকি দেয়া প্রভৃতিতে– এমপিওভুক্ত শিক্ষকরা আজ নাজেহাল অবস্থায় নিপতিত রয়েছে; সে-ক্ষেত্রে যদি এসব পরিচালনা পর্ষদের সদস্যদের মধ্যে কোনো বিরোধ সৃষ্টি হয়। তবে তার দায়-ভার শিক্ষক কেন বহন করবে? শিক্ষক কি এ-সব সদস্যদের মাঝে সমঝোতা করার ধৃষ্টতা দেখাতে পারে? কেননা, এ-সব সদস্য অধিকাংশই স্থানীয় ও প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা কিংবা ব্যক্তিত্ব। অন্যদিকে আর্থিক দায় ভার সংশ্লষ্ট প্রতিষ্ঠানকে বহন করতে বলা হয়েছে কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠান কোথায় থেকে এতো বিপুল অর্থের যোগান দিবে? আবার অন্যভাবে বলা যায় ব্যবস্থাপনা কমিটি কিংবা পরিচালনা কমিটির সংজ্ঞায় বলা হয়েছে– শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে গঠিত হয়েছে কমিটি। তবে প্রশ্ন হলো সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য কমিটি যদি কোনো অসুষ্ঠু কাজ করে তবে তার দায় শিক্ষক সমাজ কেন নিবে?

৬.২ এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের জন্যই কেবল এ-আইন সরকারি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের জন্য নয়: এটি নামে একটি শিক্ষা-আইন হলেও মূলত শাস্তি প্রদান কিংবা বেতন বন্ধের জন্য কেবলমাত্র এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বেলাতে প্রযোজ্য বলে বুঝানো হয়েছে। কোচিং বাণিজ্য বিংবা প্রাইভেট টিউশনি সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা বন্ধ না-করলে তাদের বিরুদ্ধে কি ধরনের ব্যবস্থা নেয়া হবে– সে সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। একই ভাবে অন্যান্য যে-কোনো অপরাধের জন্য সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্টানের শিক্ষকদের দায় মুক্তি দেয়া হয়েছে সুতরাং এ-টি একটি একপক্ষীয় আইন, সার্বজনীন নয়।

৭ সেইসব প্রেতাত্মারা :

আজ ২০১৬ সালে এসেও ২০০৫ সালের সচিবালয় বা মন্ত্রণালয়ের ঐসব সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলো বহাল তবিয়তে এবং আরও শক্তিশালী হয়েই রয়েছে। আর রয়েছে বর্তমান সরকার প্রধানের জোরালো সমর্থন। তাই হেফাজতে ইসলামের দাবির প্রতি পূর্ণ সমর্থন দিয়ে– প্রাথমিকের বইয়ে– সংকলন রচনা ও সম্পাদনায় নিযুক্ত শিক্ষাবিদদের না জানিয়ে অন্যায়ভাবে, নিয়মবহির্ভূত-উপায়ে পাঠ্যসূচী পরিবর্তন করা হলো। এখানে মন্ত্রণালয়ের পূর্ণ সমর্থন ও সহযোগিতা যে রয়েছে তা তো তথ্য প্রমাণেই বেরিয়ে আসছে। ৬ষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণির বই– যে-গুলোতে হেফাজতে ইসলামের দেয়া পাঠ্য বিষয়গুলো প্রথমে বাদ পড়েনি অথচ ছাপা হয়ে গেছে, সে-গুলো রাতের আঁধারে ঢাকার অদূরে নিয়ে বিশাল গর্তখুড়ে পুতে মাটি চাপা দিয়ে বুলডোজার দিয়ে মিশিয়ে দেয়া হয়েছে। এতে সরকারের টেক্স বুক বোর্ডের কারও মতে একশ' কোটি মতান্তরে চারশ' কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে। আর এ-সব নির্দেশ সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে যে দেয়া হয়েছে– কোনো ভাবেই তা অস্বীকার করা যায় না। কারণ বাংলাদেশের কোনো পিপিলিকারও ক্ষমতা নেই সরকার প্রধানের বিনা নির্দেশে নড়া-চড়া করার।

৭.১. যে ভঙ্গিমায় পাঠ্যপুস্তকে পরিবর্তন আনা হলো

ভোরের কাগজের রিপোর্ট অনুযায়ী

‘২০১৬ সালের শুরুর দিকে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডে (এনসিটিবি) ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের দায়িত্বে ছিলেন, ড. মিয়া ইনামুল হক সিদ্দিকী। যিনি রতন সিদ্দিকী নামে পরিচিত। দুপুর বেলা বিভিন্ন মাদ্রাসার বেশ কিছু শিক্ষক নেতা পাঠ্যবই নিয়ে তার সঙ্গে বৈঠক করতে আসলেন। বৈঠকে তারা বিভিন্ন শ্রেণির পাঠ্যবইয়ের যা যা পরিবর্তন করতে হবে তার তালিকা দিলেন। পরে হেফাজতে ইসলামও এরকম একটি তালিকা দেয়।

ওই তালিকা অনুযায়ী, এক শ্রেণির ইংরেজি বইয়ের একটি অনুচ্ছেদে ‘উত্তম’ নামে একটি চরিত্র ছিল। ইসলামি নেতারা বললেন, ‘উত্তম’ নামটি কেটে ‘অলিউল’ করতে হবে। এর কারণ জানতে চাইলে ইসলামি নেতাদের মন্তব্য, ‘উত্তম’ হিন্দু শব্দ হওয়ায় বাদ দিতে হবে। এরপরে উত্তম নামটি রাখার পক্ষে বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে কথা বললেন রতন সিদ্দিকী। একপর্যায়ে তা মানেনও ইসলামি নেতারা। কিন্তু ওই সময় পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের একজন উধর্ষ্তন কর্মকর্তা রতন সিদ্দিকীকে বলে ওঠেন, ‘স্যার হুজুরদের বক্তব্য ঠিক আছে। হুজুরদের বক্তব্য অনুযায়ীই পাঠ্যবই রচনা হওয়া উচিত।’

রতন সিদ্দিকী ওই দিনের ঘটনা স্মরণ করে বলেন, এনসিটিবির কর্মকর্তার ওই কথা বলার পর হুজুরদের আর কোনো যুক্তি দিয়ে আটকানো যায়নি। পরে হেফাজতে ইসলামও তালিকা দেয়। একপর্যায়ে হুজুরদের কথা অনুযায়ী পাঠ্যবইয়ে পরিবর্তন আনা হয়। এই পরিবর্তনকে তিনি ১৯৬৯ সালে পাঠ্যবই পরিবর্তনের ঘটনার সঙ্গে মিল রয়েছে বলে জানান। তিনি বলেন, ৪৮ বছর আগে যা হয়েছিল, এতবছর পরে এসে ২০১৭ সালে তা হয়েছে। পাঠ্যবইয়ে সাম্প্রদায়িকতার জন্য যতটা না হেফাজত কিংবা অন্যরা দায়ী তার বেয়ে বেশি দায়ী পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের কিছু অতি উৎসাহী কর্মকর্তা। যারা মুখে মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক হলেও মননে হেফাজতপন্থী।

৭.২. পরিবর্তনগুলো বেদনাদায়কঃ পঞ্চম শ্রেণীর বাংলা বই থেকে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ হুমায়ুন আজাদের ‘বই’ কতিবাটি বাদ দেয়া হয়েছে। তিনি তার কবিতায় লিখেছেন, ‘যে বই তোমায় দেখায় ভয় সেগুলো কোন বই-ই নয়/ সে-বই তুমি পড়বে না/ যে-বই তোমায় অন্ধ করে যে-বই তোমায় বন্ধ করে/ সে-বই তুমি ধরবে না/” হুমায়ূন আজাদ তার কবিতায় কোন বইয়ের নাম উল্লেখ করেনি; হেফাজতের হুজুরেরা মনে করছেন, বই দিয়ে কুরআন শরীফকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। এতে নাকি কোমলমতি শিশুদের ইসলাম বিদ্বেষী করা হচ্ছে। ষষ্ঠ শ্রেণীর বাংলা বইয়ে এসে ওয়াজেদ আলীর ‘রাঁচি ভ্রমণ’ বাদ দেওয়ার কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে ভারতের ঝাড়খণ্ডের রাজধানী রাঁচি হিন্দুদের একটি তীর্থস্থান। একই শ্রেণীর সত্যেন সেনের ‘লাল গরুটা বাদ দেওয়া হয়েছে গুরু মায়ের মতো উল্লেখ করে মুসলমান বাচ্চাদের নাকি হিন্দুত্ববাদ শেখানো হচ্ছে।
সপ্তম শ্রেণীর বাংলা বইতে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘লাল ঘোড়া’ গল্পটি বাদ দেওয়ার কারণ– গল্পে লালু নামে একটি ঘোড়া ছিল। এতে পশুর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে। বাদ পড়েছে সুকুমার রায়ের ‘আনন্দ’ কবিতা। কালিদাস রায়ের ‘অপূর্ব প্রতিশোধ’ কবিতা ইসলামের প্রশংসা করে লেখা হয়েছে তবুও কবিতাটি বাদ দেওয়া হয়েছে। বাদ পড়েছে স্বর্ণকুমারী দেবীর ‘উপদেশ’ কবিতাও। রণেশ দাশগুপ্তের 'মাল্যদান' গল্পে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ফুটে উঠেছে; অথচ এটাও বাদ পড়েছে। মধ্যবিত্ত বাঙালির ঘরে ঘরে পবিত্র কোরআন, বেদ ও গীতার পরে সর্বাধিক পঠিত লেখক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর বিখ্যাত গল্প 'লালু' বাদ দেওয়ার হয়েছে। অষ্টম শ্রেণীর বাংলা বইয়ে রবীন্দ্রোত্তর যুগের বাংলা সাহিত্যের বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী বুদ্ধদেব বসুর 'নদীর স্বপ্ন' কবিতাটি বাদ দেয়া হয়েছে। উপ্রন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী রচিত 'রামায়ণ কাহিনী-আদিখণ্ড' শীর্ষক গল্পটি বাদ পড়েছে। নবম শ্রেণীর বাংলা বইতে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বিখ্যাত 'পালামৌ' গল্পটি বাদ দেওয়া হয়েছে। জ্ঞানদাস রচিত ‘সুখের লাগিয়া’ কবিতাটি বাদ পড়েছে। বাদ পড়েছে ভারতচন্দ্র গুণাকর রচিত ‘আমার সন্তান’ কবিতাটি। বাঙলার মানবতাবাদী সংস্কৃতির প্রতীক মরমী সাধক লালন শাহ রচিত 'সময় গেলে সাধন হবে না' কবিতাটি বাদ পড়েছে। এ তালিকায় আরো আছে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘স্বাধীনতা’, জনপ্রিয় কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘সাঁকোটা দুলছে’। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘বাংলাদেশের হৃদয়’ কবিতাটি বাদ দেওয়া হয়েছে।

‘আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি/তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী!/ ওগো মা, তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে!/তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে॥/ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে, বাঁ হাতে করে শঙ্কাহরণ,/ দুই নয়নে স্নেহের হাসি, ললাটনেত্র আগুনবরণ।/ওগো মা, তোমার কি মুরতি আজি দেখি রে!/ তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে॥/ তোমার মুক্তকেশের পুঞ্জ মেঘে লুকায় অশনি,/ তোমার আঁচল ঝলে আকাশতলে রৌদ্রবসনী!/ ওগো মা, তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে!/ তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে॥/ যখন অনাদরে চাই নি মুখে ভেবেছিলেম দুঃখিনী মা/আছে ভাঙা ঘরে একলা পড়ে, দুখের বুঝি নাইকো সীমা।/ কোথা সে তোর দরিদ্র বেশ, কোথা সে তোর মলিন হাসি-/আকাশে আজ ছড়িয়ে গেল ওই চরণের দীপ্তিরাশি!/ওগো মা, তোমার কী মুরতি আজি দেখি রে!/ তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে॥/আজি দুখের রাতে সুখের স্রোতে ভাসাও ধরনী-তোমার অভয় বাজে হৃদয় মাঝে হৃদয় হরণী!/ওগো মা, তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে!/তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে॥’/

–হৃদয়ের যন্ত্রণা থেকে কবিতাটি পুরোটিই উদ্ধৃত করলাম। কারণ ১৯৭১-এর ২৩শে মার্চ রাত ১২টায় পাকিস্তানী পতাকা দিয়ে শেষ করার কথা ছিল টেলিভিশন কর্তৃপক্ষের। এই গানসহ আরও কিছু রবীন্দ্রসঙ্গীত দিয়ে শিল্পীরা তখন যেন যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তাই এই গানগুলো আমাদের প্রাণের।
শেষ কথা- আমরা কি আলোচনা করেই শেষ করব? নাকি সরকারের কাছে দাবি জানান– সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত দেশ গড়তে অসাম্প্রদায়িক পাঠ্যপুস্তক চাই মর্মে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: *দৈনিক সংবাদ, দৈনিক প্রথম আলো, দৈনিক কালের কণ্ঠও ভোরের কাগজ*